সংবাদ পরিষেবা | জানুয়ারি ২০২২

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

সরকারি হিসেবে বন বাড়ছে

২৭/৪১

ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সম্প্রতি দেশের বনাঞ্চল নিয়ে সমীক্ষা 'ইন্ডিয়া স্টেট অব ফরেস্ট রিপোর্ট' ২০২১ প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশের মোট বন ও বৃক্ষের পরিমাণ ৮০.৯ মিলিয়ন হেক্টর, যা দেশের ভৌগলিক আয়তনের ২৪.২৬ শতাংশ। বর্তমান সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ২০১৯ সালের তুলনায় মোট বন ও গাছের পরিমাণ ২,২৬১ বর্গ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ১৭টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ভৌগলিক অঞ্চলের ৩৩ শতাংশের বেশি বনভূমি রয়েছে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী, বনের আচ্ছাদন, গাছের আচ্ছাদন, ম্যানগ্রোভ বা বাদাবনের আচ্ছাদন ক্রমশ বাড়ছে।

রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে -
গভীর ও ঘন বনের পাশাপাশি খোলা বনের আয়তনও বেড়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে ৬৪৭ বর্গ কিলোমিটার, তেলেঙ্গনায় ৬৩২ বর্গ কিলোমিটার এবং ওড়িশায় ৫৩৭ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অঞ্চল অনুযায়ী দেশের বৃহত্তম বনভূমি রয়েছে মধ্যপ্রদেশে। এরপরের তালিকায় রয়েছে অরুণাচল প্রদেশ, ছত্রিশগড়, ওড়িশা এবং মহারাষ্ট্র। মোট ভৌগলিক এলাকার শতাংশ হিসেবে বনাঞ্চলের ক্ষেত্রে শীর্ষ পাঁচটি রাজ্য হচ্ছে, মিজোরাম (৮৪.৫৩ শতাংশ), অরুণাচল প্রদেশ (৭৯.৩৩ শতাংশ), মেঘালয় (৭৬.০০ শতাংশ), মনিপুর (৭৪.৩৪ শতাংশ) এবং নাগাল্যান্ড (৭৩.৯০ শতাংশ)।

১৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভৌগলিক এলাকার ৩৩ শতাংশের বেশি বনভূমির আওতায় রয়েছে। এই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে লাক্ষাদ্বীপ, মিজোরাম, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অরুণাচল প্রদেশ এবং মেঘালয়। এছাড়াও মনিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, গোয়া, কেরল, সিকিম, উত্তরাখণ্ড, ছত্রিশগড়, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ, আসাম, ওড়িশায় বনভূমি রয়েছে ৩৩ থেকে ৭৫ শতাংশের মতো।

দেশে মোট ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের পরিমাণ ৪,৯৯২ বর্গ কিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও যে তিনটি রাজ্যে ম্যানগ্রোভ অঞ্চল রয়েছে সেগুলি হচ্ছে , ওড়িশা (৮ বর্গ কিলোমিটার), মহারাষ্ট্র (৪ কিলোমিটার) এবং কর্ণাটক (৩ বর্গ কিলোমিটার)

জৈব চাষে সরকার

২৭/৪২

সরকার পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা বা পিকেভিওয়াই এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য মিশন অরগ্যানিক ভ্যালু চেন ডেভেলপমেন্ট ইন নর্থ ইস্ট রিজিয়ন (এমওভিসিডিএনইআর)-এর মাধ্যমে চাষিদের জৈব চাষে উৎসাহ দিচ্ছে। এই দুটি প্রকল্প ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে শুরু হয়েছিল। প্রকল্প দুটির মাধ্যমে চাষিরা জৈব পদ্ধতিতে ফসল ফলালে তার জন্য শংসাপত্র বা সার্টিফিকেট দেওয়া, জৈব ফসল বাজারজাত করা এবং তার প্যাকেজিং ও মজুত করার কাজে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

পিকেভিওয়াই দেশের সব রাজ্যে জৈব চাষে উৎসাহ দিয়ে থাকে। প্রকল্পটিতে তিন বছরের মেয়াদে চাষিদের হেক্টর পিছু ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এর মধ্যে বীজ কেনা, জৈব সার, জৈব কীটরোধক, কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্টসহ বিভিন্ন জৈব উপাদান সংগ্রহ করতে চাষিদের হেক্টর পিছু ৩১ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

এমওভিসিডিএনইআর-এর মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চাষিরা কৃষিপণ্য উৎপাদক সংস্থার মাধ্যমে জৈব চাষে উৎপাদিত ফসলের প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজারজাত করার সহায়তা পান। এই প্রকল্পে কৃষিপণ্য উৎপাদক সংস্থা গঠন করলে চাষিদের হেক্টর পিছু তিন বছরের জন্য ৪৬,৫৭৫ টাকা দেওয়া হয়। এর সাহায্যে তারা উন্নতমানের বীজ সংগ্রহ করতে পারেন। তাদের আর্থিক সাহায্যের জন্য কৃষিপণ্য উৎপাদক সংস্থা এবং বেসরকারি শিল্পোদ্যোগীদের যথাক্রমে ৭৫ শতাংশ এবং ৫০ শতাংশ হারে ভরতুকি দেওয়া হয়। এই অর্থে উৎপাদিত ফসল মজুত রাখা, সেগুলি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে পাঠানো, ফসল সংরক্ষণ করে রাখার মতো বিভিন্ন কাজে সহায়তা করা হয়।

এগুলি ছাড়াও মিশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ হার্টিকালচার, ন্যাশনাল প্রজেক্ট অন অরগ্যানিক ফার্মিং, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের মাধ্যমে ন্যাশনাল প্রজেক্ট অন অরগ্যানিক ফার্মিং প্রকল্পে জৈব চাষে সাহায্য করা হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের পরিমাণ বাড়ছে ২৭/৪৩

বিগত কয়েক বছরে ঘূর্ণিঘড় এবং ভারী ও অতিভারী বৃষ্টির পরিমাণ বেড়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০২০ পর্যন্ত সময়কালে, ভারত মহাসাগর (বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর) অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়ের তথ্য বিশ্লেষণে এসব জানা গেছে। বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের ওপর সৃষ্টি হওয়া পাঁচটি ঘূর্ণিঝড়ের গড়ে তিন থেকে চারটি ভূমিতে আছড়ে পড়ে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির নিচু উপকূলীয় অঞ্চলগুলি এইসব ঝড়ের প্রভাবে বেশি প্রভাবিত হয়েছে। তবে বর্তমানে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ নিখুঁত হওয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলেও, প্রচুর সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। মারা পড়ছে অনেক গবাদি পশু।

প্রাকৃতিক পুঁজির মাপকাঠি ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট ২৭/৪৪

সুব্রত কুন্ডু

আমাদের চাহিদা মেটাতে, যে বর্জ্য আমরা তৈরি করি তা বিলীন হতে বা প্রকৃতিতে মিশে যেতে দেড় খানা পৃথিবী দরকার। গ্লোবাল ফুটপ্রিন্ট নেটওয়ার্ক নামে একটি সংস্থা এই হিসেব করে। এর থেকে তারা প্রতিবছর আর্থ ওভারসুট ডে বলে একটি দিন ঠিক করে। আর্থ ওভারসুট ডে হল একটি দিন, যে দিনটির মধ্যে আমরা ওই বছরে, আমাদের জন্য বরাদ্দ সম্পদ ব্যবহার করে ফেলি। ২০২১-এ এই দিনটি ছিল ২৯ জুলাই। ২০০০ সালে ওভারসুট ডে ছিল ২৩ সেপ্টেম্বর আর ২০১০ থেকে ১৮ সালের মধ্যে এই দিনটি অগাস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছে। ২০২০ তে আমরা পৃথিবীর সম্পদ কম ব্যবহার করেছিলাম করোনা মহামারির কারণে। তাই এই দিনটি পেছিয়ে হয়েছিল ২২ অগাস্ট।

এই তথ্য বলছে, প্রাকৃতির সম্পদ ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ছে। আর আমরা চাইলে, এই সম্পদ ব্যবহার কমাতেও পারি। যদিও হিসেবটি নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে কিছু বতর্ক আছে। তবে বেশিরভাগ বিজ্ঞানী স্বীকার করেন যে, এটি ভঙ্গুর উন্নয়ন ব্যবস্থাকে খুব ভালোভাবেই বোঝাতে পারে।

হিসেবটি আর একটু সহজ করে বলা যাক, আপনি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কথা ভাবুন। ধরা যাক, ব্যাংক অ্যাকাউন্টটিতে আপনার আয় জমা আছে যা সারাবছর ধরে খরচ হবে। অন্য কোনো আয় আপনার নেই। কিন্তু ওই অ্যাকাউন্ট থেকে সব টাকা ২৯ জুলাইয়ের মধ্যে খরচ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে বছরের বাকি দিনগুলি কীভাবে চলবে? হয় ঋণ নিয়ে বা আপনার বা পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া পুঁজিপাটা ভেঙে। তাইতো? প্রকৃতির ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ে শোধ দেওয়ার কিছু নেই। পুরোটাই পুঁজি ভেঙে খাওয়া। এক্ষেত্রে আমাদের লাভ বা লোভের সংস্কৃতির জন্য পরের প্রজন্মকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছি।

এই যে এতো হিসেবের কথা বলা হচ্ছে, সে হিসেব মাপা হয় ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট বা প্রাকৃতিক পদাঙ্ক দিয়ে। সংক্ষেপে, প্রাকৃতিক পদাঙ্ক হল, প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব বের করার একটি পরিমাপ।

আরো একটা বিষয় হল বায়োক্যাপাসিটি বা জৈবিক ধারণ ক্ষমতা। আমাদের চাহিদা মেটাতে, আর যে বর্জ্য তৈরি করি তা বিলীন হতে বা প্রকৃতিতে মিশে যেতে যতটা উৎপাদনক্ষম জায়গা লাগে সেটাকে বলে বায়োক্যাপাসিটি বা জৈবিক ধারণ ক্ষমতা। এই জৈবিক ধারণ ক্ষমতা এবং প্রাকৃতিক পদাঙ্ক মাপা হয় গ্লোবাল হেক্টর দিয়ে।

আর একটু বিশদে বোঝা যাক, বায়োক্যাপাসিটি এবং ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্টের ভারসাম্যের সম্পর্ক। ভারতে বায়োক্যাপাসিটি হল ০.৪৫ গ্লোবাল হেক্টর। অর্থাৎ প্রতিটি ভারতীয়দের চাহিদা মেটাতে আর তার তৈরি বর্জ্য প্রকৃতিতে বিলীন হওয়ার জন্য রয়েছে গড়ে ০.৪৫ গ্লোবাল হেক্টর। অর্থাৎ প্রতিটি ভারতীয়ের চাহিদা মেটাতে, আর তার তৈরি বর্জ্য প্রকৃতিতে বিলীন হওয়ার জন্য রয়েছে গড়ে ০.৪৫ গ্লোবাল হেক্টর উৎপাদনক্ষম জায়গা। আর ২০২১ সালে গড়ে ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট হল ১.১৬ গ্লোবাল হেক্টর। এই হিসেব অনুযায়ী আমাদের দেশে যতটা উৎপাদনক্ষম জায়গা রয়েছে তার থেকে .৭১ বেশি গ্লোবাল হেক্টর জায়গার সম্পদ আমরা ব্যবহার করছি।

আবার কানাডার বায়োক্যাপাসিটি হল ১৬.০১ আর ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট ৮.১৭। তাহলে কানাডা তাদের উৎপাদনক্ষম জায়গার থেকে ৭.৮৪ কম গ্লোবাল হেক্টর ব্যবহার করছে। এই হিসেবে তাহলে ভারতীয়রা কানাডাবাসীর তুলনায় কম প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করলেও তাদের অবস্থা বেশ খারাপ। আর কানাডার নাগরিকদের অবস্থা অনেকটাই ভালো! না এটা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। কারণ পৃথিবীর গড় বায়োক্যাপাসিটি হল ১.৬৩ গ্লোবাল হেক্টর। আর ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট ২.৭৩ গ্লোবাল হেক্টর। মানে সারা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পুঁজি ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বিপদে সবাই এবং এই বিপদের জন্য দায়ি তারাই যারা লাগামছাড়া প্রাকৃতিক শোষণ করছে।

সম্প্রতি স্কটল্যান্ডের গ্লাসগ্লো শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কপ-২৬ বা ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স। এর আগে এরকম ২৫টি জলবায়ু বদল নিয়ে সম্মেলন হয়ে গেছে। এছাড়া আরো অনেক রকম সভা সমিতি হয় পৃথিবীর জুড়ে। সেখানে বিভিন্ন দেশের নেতারা জলবায়ু বদল রুখতে নানা প্রতিশ্রুতি দেন। সেসব নিয়েই তৈরি হয় নানা রকম উন্নয়ন লক্ষ্য। যদিও তার বেশিরভাগটাই পালন হয় না। হয় না তার কারণ, এই যে ভঙ্গুর উন্নয়ন প্রক্রিয়া, তার থেকে কেউই সরে আসতে চায় না। আর তাই দেশগুলির ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট বাড়তে থাকে।

যে কথা বলছিলাম, বহুবছর ধরে শান্তি, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি কথা বলে আমরা গোটা পৃথিবীটাকেই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছি। নানারকম বেড়া তৈরি করেছি, 'অপরদের' আটকানোর জন্য। এরজন্য নানা রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক যুক্তি খাড়া করা হয়েছে। লক্ষ্য, লাভ ও লোভের ভঙ্গুর উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে টিকিয়ে রাখা। শিল্প সভ্যতার ২৫০ বছরের মধ্যে প্রায় ২০০টি রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে। এর আগে বর্তমান রাষ্ট্রের ধারণাই ছিল না।

এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে আরো টুকরো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে পৃথিবীর, প্রকৃতির। তবে একটা কথা বোঝা দরকার, রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রে যেতে আমাদের ভিসা, পাসপোর্ট অনুমতি লাগে। পশুপাখির লাগে না। জল, হওয়ার লাগে না। তাই কোথাও প্রাকৃতিক চক্রগুলি ভেঙে পড়লে, প্রকৃতি দূষিত হলে, তার প্রভাব পড়ে অন্য রাষ্ট্রে। প্রভাব পড়ে সারা পৃথিবীতে, প্রকৃতিতে এবং তার ওপর নির্ভর করে থাকা সমগ্র জীবকূলের ওপর। যে জন্যই পৃথিবী গরম হচ্ছে। দ্রুত জলবায়ু বদল হচ্ছে। একদিকে বরফ গলে যাচ্ছে। অন্যদিকে সমুদ্র ফুলে ফেঁপে উঠছে। তার ফল ভোগ করছে সমগ্র জীবকূল।

বেঁচে বর্তে থাকলে হলে তাই ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট কমানো ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই। সেজন্যই লাভ আর লোভের ভঙ্গুর উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং ভোগের সংস্কৃতি থেকে রাষ্ট্রকে, সমূহকে, ব্যক্তিকে দূরে সরতে হবে। হবেই।

মতামত নিজস্ব

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস,
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু